Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 433 – 443
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 433 – 443
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কার্তিক লাহিড়ীর জীবন ও সাহিত্য

অমিত মুর্মু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২
Email ID : amitmurmu914@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024
Selection Date 20. 07. 2024

Keyword
Unsung novelist, memoirist, biographer, musicologist, translator.

Abstract
Karthik Lahiri is an unsung fiction writer in Bengali literature. A major reason for its hitherto unexplored nature, we think, is the fact that he spent much of his work and most of his life in North-East India, separated from the literary heartland of Calcutta. From the middle of the 19th century he devoted himself to various branches of literature. His literary career began by writing a story called 'Bondi' (1949) in the newspaper 'Dainik Kishore'. Since then, he has written numerous stories, novels, plays and also translated. Another special interest of Karthik Lahiri is music. Be it Indian classical music or foreign symphonies or Hindi songs, the writer had a keen interest in all types of music. So we see the free use of music in his novels. Although Karthik Lahiri has been discussed in various newspapers and magazines, it has been limited to a small extent. Earlier in these magazines 'parichay', 'Parampara' and 'Abong ei somoy'- all these papers had a little discussion about the author, but in them, apart from aspects of his stories, novels or translations, there was a deep interest in the various subjects which had been developed in detail. Deficiency found. While discussing about Karthik Lahiri, we will try to uncover the unlit side of his life in the same way as his novel will come up in this discussion. Naturally this discussion will include an attempt to look at his life. Because his novels are the product of his life experience. They become much clearer to us from the memoirs of the author and the memoirs of his loved ones. Above all we will see his personal life and literary life in this discussion. How this person's life influences his literature, and we will immediately see how his life experiences shape his literary philosophy.

Discussion

কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাটককার কার্তিক লাহিড়ীর জন্ম ১৯৩২ সালে। বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া শহরে। পিতা হারাণচন্দ্র লাহিড়ী ও মাতা শৈবালিনী দেবী। পিতা হারাণচন্দ্র লাহিড়ীর কর্মক্ষেত্র বেতিয়া শহর হওয়াতে কার্তিক লাহিড়ীর শৈশব কাটে বেতিয়া শহরেই। সেখানেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। বেতিয়াতেই তিনি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা

করেন। তার পরবর্তী পড়াশোনার জন্য চলে যান পাবনা শহরে তাঁর বড়দিদি-জামাইবাবুর কাছে। সেখানে তিনি গোপালচন্দ্র ইন্সটিটিউটে পড়াশোনা শুরু করেন। তাঁর জামাইবাবু ছিলেন ওই স্কুলেরই অঙ্ক-বিজ্ঞানের শিক্ষক। সেখান থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৭ সালে। আর সেই বছরই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ও দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় দেশ। লেখক তখন ষোলো বছরের তরতাজা এক যুবক। প্রত্যক্ষ করছেন তাঁর জীবনের সব থেকে বিস্ময়কর একটি ঘটনা যা তাঁকে সারাজীবন বয়ে চলতে হয়েছে।

তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। তখন কলকাতার স্টেশনে স্টেশনে শরণার্থীদের ভিড়। কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। সেই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে ১৯৪৯ সালে পাশ করেন আই.এস. সি। ১৯৫১ সালে কলকাতারই একটি কলেজ থেকে পাশ করেন বি.এস. সি। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কার্তিক লাহিড়ী কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে পরবর্তী পড়াশোনা করছেন না। তার পরিবর্তে এম.এ করছেন বাংলা নিয়ে। শুধু এম.এ-তেই থেমে থাকছেন না। পরবর্তীতে সুকুমার সেনের অধীনে পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করছেন ১৯৬৫ সালে।

কার্তিক লাহিড়ী মূলত বিশ শতকের ছয়ের দশকের কথাসাহিত্যিক। বিশ শতকের চারের দশকের শেষ দিক থেকে বাঙালির জীবনে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। পাঁচের দশকের শুরুতেই এসেছে আমূল পরিবর্তন। এই সময়টি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। ১৯৪৫ সালে শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পরের বছর স্বাধীনতা লাভ এবং দেশভাগ বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে নিয়ে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা মানুষের জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। এতদিনের প্রচলিত সংস্কার, মূল্যবোধের ভীত যায় নড়ে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস, মানুষের প্রতি নির্ভরতা ও মূল্যবোধ বজায় রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। শুরু হয় নিজের অস্তিত্বকে বাঁচানোর লড়াই। স্বাভাবিকভাবে মানুষ প্রাণ রক্ষার জন্য বিসর্জন দিতে থাকে মানবিকতা। সমাজের ও মানবজীবনের পরিবর্তনের প্রভাব থেকে সাহিত্যও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। কারণ সাহিত্য সমাজের দর্পণ। ফলে সমসাময়িক ঘটনা যে সাহিত্যে ছাপ ফেলবে এটাই প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে কার্তিক লাহিড়ীও ব্যতিক্রমী নন। কার্তিক লাহিড়ীর সাহিত্যও তাঁর জীবন অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ। তিনি যা দেখেছে বা প্রত্যক্ষ করেছেন সেটাই তিনি তাঁর সাহিত্যে অত্যন্ত কঠোর ভাবে তুলে ধরেছেন। প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবর্তে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে সমাজের রূঢ় বাস্তব দিক। নিম্নবিত্ত মানুষদের দুঃখ-যন্ত্রণা, সমাজের উচ্চশ্রেণির দ্বারা শোষণ, মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অস্তিত্বের সঙ্কট ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও মূল্যবোধের অভাব। একইভাবে রাজনৈতিক দল উপদলের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসবাদ, ব্লাকমেল, দুর্নীতির দিকগুলি তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি প্লট নির্মাণ করেছেন আবার কোনো ক্ষেত্রে তিনি স্বপ্ন ও বাস্তবতাকে আশ্রয় করে অতিবাস্তব এক কাহিনি নির্মাণ করেছেন। লেখকের দীর্ঘ জীবনের এই কালপর্বে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পেশায় এবং সর্বোপরি বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। এই মানুষদের সংস্পর্শে এসে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে নানান মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেগুলি আমাদের কার্তিক লাহিড়ীর সাহিত্যদর্শন সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারনা প্রদান করে।

আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব, তাঁর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাচ্ছে পাবনাতে থাকাকালীনই। সত্রাজিৎ গোস্বামী সম্পাদিত ‘পরম্পরা’ পত্রিকার ক্রোড়পত্রে ‘মেলা-মেশা’ নামাঙ্কিত সংকলন থেকে জানতে পারি লেখকের স্কুলের একটি ছোটো ঘটনা। যেটির উল্লেখ এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক—

> “তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে, লেখার কাগজের খুব চাপা-চাপি, স্লিপ পায় ছাত্ররা, সেই স্লিপ দেখিয়ে পাওয়া যায় খাতা-রুলটানা এক্সারসাইজ বুক—টিটাগড় কাগজের তেমন একটা তিন-কি-চার নম্বরের খাতায় লিখে ফেলি একটা গল্পগোছের কিছু, তখন জানতাম—উপন্যাস, খুব সন্তর্পণে বাচ্চুকে দেখতে দিলাম, সে কয়েকদিন পর তা আমাকে ফিরিয়ে দিল বিনা মন্তব্যে, আমিও কোনো কথা না বলে চট করে লুকিয়ে ফেললাম খাতাটি পকেটের কোথাও, লজ্জা! বই কি! বাড়িতে এসে পাতার পর পাতা উলটোই, দু-এক জায়গায় সামান্য চিহ্ন, তবে কি কিছুই হয়নি! কিন্তু শেষের পাতায় এসে চোখ একেবারে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 433 – 443
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> জ্বলজ্বল করে ওঠে-'বাংলা সাহিত্যে সুসংবাদ একজন নতুন লেখকের আবির্ভাব'... অনেকখানি সে লিখেছিল ওই লেখা সম্বন্ধে।"[১]

উল্লেখ্য বাচ্চু লেখকের স্কুলজীবনের বন্ধু সুরজিৎ বসু। আমাদের আর কোন সংশয় রইল না যে স্কুলে পড়াকালীনই কার্তিক লাহিড়ী লেখালিখির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলছেন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াকালীনই কার্তিক লাহিড়ীর 'বন্দী' নামে একটি গল্প 'দৈনিক কিশোর' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। সময়টি ১৯৪৮-১৯৪৯ নাগাদ। যদিও লেখক পদ্যরচনা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন পরবর্তীতে তিনি গদ্যরচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই যে লেখা শুরু হল তারপর জীবনের বাকি অংশ তিনি লেখালিখিতেই মগ্ন থেকেছেন। যেহেতু তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তাই তাঁর কর্মক্ষেত্র শুরু হয় বিহারেরই ছাপরা রাজেন্দ্র কলেজের রসায়ন বিভাগে একজন ডেমন্সট্রেটর হিসাবে। তারপর অনেকদিন জলপাইগুড়ি ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। থাকতেন পি. ডাবলু. ডি.-র মেসে। এই চাকরি পাওয়ার পূর্ববর্তী একটি ঘটনা কার্তিক লাহিড়ী খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন, সেটি হল- গিরিডি-র কোনো একটি কলেজে চাকরির পরীক্ষার জন্য গেছেন। সেখানে চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা হয়ে গেল যে, চাকরিটা তিনিই পাবেন কারণ কলেজের অধ্যক্ষ নাকি লেখকের পূর্বপরিচিত। এই সবের মধ্যে তাঁর কানে গেল 'ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন বাবুটি একলা, ওরই হবে বুঝলে।'– সেখানে দাঁড়িয়ে যে ভদ্রলোক এই কথাটি বলেছিলেন, পরবর্তীতে সে হয়ে উঠেছিল তাঁরই খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমিতাভ দাসগুপ্ত। আর সব থেকে মজার বিষয় হল ওই কলেজে লেখকের চাকরিটাও শেষ পর্যন্ত হয়নি। লেখক একটি কলেজের চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে গেছেন। এবং তিনি সেই চাকরি পাচ্ছেন না। যেখানে সবাই ধারণা করেই নিয়েছিল যে চাকরিটা তিনিই পাবেন। এখানে বাস্তবটা যে কতটা কঠিন সেটি লেখক অনুভব করতে পেরেছেন। বাস্তবতা সম্পর্কে লেখকের একটা অভিজ্ঞতা এখানে তৈরি হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা লেখককে কোথাও না কোথাও পরবর্তীতে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই তাঁর 'স্বেচ্ছামৃত্যু' উপন্যাসে দেখি, কীভাবে একটা চাকরির জন্য বাদল হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনরকম ভাবেই সে কিন্তু এই খরার বাজারে একটা চাকরি জোটাতে পারে না। তাঁর বাবার রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে আসছে যত, ততই তাঁর প্রতি চাপ বাড়ছে। কারণ তাঁর বাবার পর তাকেই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। উপন্যাসে বাদলের বাবা বাসুদেব বাবুর মুখে আমরা শুনি—

> "লোকে সাধ্য সাধনা করে সরকারি একটা চাকরি পাবার জন্য, কারণ
> গভর্নমেন্টের চাকরিতে নিশ্চয়তা, একবার
> ঢুকতে পারলেই হল, কোনো কারনে হুটহাট বরখাস্ত করা বা তাড়ানো যায় না। ডিফালকেসন্ অফ মানি কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীতার বা অন্য কোনো নৈতিক অধঃপতন হলে
> একটা চান্স থাকে চাকরি যাবার, তবু যাওয়া সহজ হয় না, প্রথমে শো-কজ্, তারপর এনক্যোয়ারি কমিশন, তার রিপোর্ট পেশ, তারপর—
> সে এক এলাহি ব্যাপার, অবশ্য চাকরি পাওয়া বেশ কঠিন, কিন্তু তার চেয়ে আরও কঠিন চাকরি যাওয়া, তা ছাড়া
> এ চাকরির বড়ো কথা নিশ্চিন্তি, স্থায়িত্ব, মাইনে।"[২]

আবার উল্টোদিকে অর্ঘ্যও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারে না। আর এই জোগাড় করতে না পারার জন্য তাঁর সঙ্গে আর কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে চাইছে না বিভা। তাই বিভা তাকে চিঠির মাধ্যমে জানায় তাঁর সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একইরকম ভাবে 'অন্ত্যজ' উপন্যাসেও দেখি দুই বন্ধুর মধ্যে একজন চাকরি পাওয়ায় অন্যজন রুষ্ট হচ্ছে। তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিচ্ছে। বন্ধুর থেকে তো তাকে আলাদা করছেই এই একটা চাকরি, আবার ভাগ্যের এমন পরিহাস যে অলিন্দকে তার পরিবার থেকে আলাদা করে তুলছে এই চাকরি। অন্য দিকে 'কাপুরুষ' উপন্যাসে অমল চাকরির আশায় দিন গুনতে থাকে এবং এই চাকরি না পাওয়াটাকে সাধারণ মানুষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নিজেদের কাজে লাগায়। এইভাবেই অমলের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। যেহেতু অমল বেকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 433 – 443
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই তার বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে সবাই তাকে দিয়ে কিছু না কিছু কাজ করিয়ে নেয়। তাদের ধারণা অমলের কোনো কাজ নেই কারণ অমল কোনো চাকরি করে না। শেষে যদিও অমল কোনোরকম ভাবে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে সুপারিসপত্র জোগাড় করে তাও শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি জোটাতে পারেনি। এই উপন্যাসগুলিতে লেখকের মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বাস্তব জীবনে এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন এবং একটা সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের মূল্য তিনি জানেন। তাই উপন্যাসগুলিতে একটি সুনিশ্চিত জীবন অন্বেষণের তাগিদ আমরা দেখতে পায়।
তারপর আগরতলা মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে বাংলার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন ১৯৬২ সালে। আর এখানেই কার্তিক লাহিড়ীর সাহিত্যমনস্কতা আরও বেশি করে তৈরি হচ্ছে। তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠা নিয়োগী লাহিড়ী বলছেন,

> “ত্রিপুরা রাজ্য যখন আগে স্বাধীন রাজপরিবার দ্বারা চালিত রাজ্য ছিল-তখন থেকেই বিভিন্ন রাজাদের অনুপ্রেরণায় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এবং সেটি এখনও বজায় আছে। আগরতলায় সাহিত্য আসর, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। এই সব সভায় স্বভাবতই কলকাতা থেকে তখনকার উঠতি ও মধ্যগগনে বিরাজমান সাহিত্যিকদের আনাগোনা ছিল। শুধু সাহিত্যকারই নয়, বিভিন্ন শিল্পী, সুরকার কে আসেননি আগরতলায়! এই প্রতিটি আসরে বাবা তো নিয়মিত যেতেনই– সঙ্গে সবসময় আমরাও যেতাম।”[৩]

এই যে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে কার্তিক লাহিড়ী একটা দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছেন এটার ফলশ্রুতি আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনে সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠতে দেখি। আমরা এই পর্বে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্য এবং আরও অন্যান্য বিষয়ের লেখকের আগ্রহ। আর সেটি আগরতলায় এসে আরও বিস্তার লাভ করতে শুরু করল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি লেখক এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে তিনি আগরতলা ছেড়ে এই সাহিত্য মহল কলকাতায় আসতে শুরু করলেন। তাঁর কন্যার স্মৃতিকথার আরেক জায়গায় আমরা পায়—

> “অধ্যাপনা শুরু হল আগরতলা শহরে। কলকাতা সাহিত্য মহল থেকে দূরে কিন্তু মানসিকভাবে কলকাতার বাংলা সাহিত্য মহলে। তাই প্রতি বছর নিয়মিত বছরে অন্তত দু-বার প্লেনভাড়া খরচ করে একজন সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়া ও থাকা মানসিক তাগিদ না থাকলে সম্ভবপর ছিল না।”[৪]

সাহিত্যের প্রতি লেখকের এই ভালোবাসাই তাঁকে বারবার টেনে এনেছে কলকাতায়। আর এই মানসিক তাগিদ থেকেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আপন করতে পেরেছেন। তাই আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লেখকের অবাধ বিচরণ দেখতে পায়।

লেখকের যেমন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল ঠিক একইরকম ভাবে লেখকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল অনেক আগে থেকেই। ছাত্রজীবন থেকেই লেখক যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই লেখকের মধ্যে এই রাজনৈতিকবোধ অনেক আগে থেকেই কাজ করে এসেছে। কার্তিক লাহিড়ী কোথাও ঘুরতে গেলেও ওই জায়গা থেকেও নিজের লেখার রসদ খুঁজতেন। বিশেষ করে সেখানকার স্থায়ীন বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টা করতেন। রাজনীতি সম্পর্কে লেখকের আগ্রহ আমরা প্রথম থেকেই দেখতে পায়। রাজনীতির সূক্ষ্ম চালকে লেখক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। তার একটি প্রমাণ পায় কন্যা শর্মিষ্ঠা নিয়োগী লাহিড়ীর স্মৃতিচারণায়—

> “বাবা সব সময় বলতেন কূপমণ্ডূক হয়ে থাকা উচিত না। বেরিয়ে পড়ে বাইরের জগৎটাকে চেনা উচিত। ভারতবর্ষের প্রায় সবকটি রাজ্যই বাবার ঘোরা। পরের দিকে অনেক সময়ই বিভিন্ন ট্যুরের সঙ্গে গেছেন। অনেক জায়গা একবারের বেশিও গেছেন। সবখানেই বাবা সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলে সেখানকার

> রাজনীতির হালচাল বোঝার চেষ্টা করতেন। হোটেল থেকে মাঝে মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে বাজারে হেঁটে আসতেন। বুঝতে পারি যে উনি লেখার রসদ খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন।”[৫]

রাজনীতির প্রতি লেখকের একটু বেশিই আগ্রহ ছিল। আমাদের মনে হয় এই আগ্রহের পিছনে লেখকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শ দায়ী। আমরা তাঁর ‘সৌরভের ঘরে আগুন’ ‘অন্ত্যজ’ ও ‘যুবক’ উপন্যাসে দেখি কীভাবে রাজনৈতিক দল উপদলের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসবাদ, ব্লাকমেল, দুর্নীতির ভয়াবহতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কীভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যেও ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে নের্তৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের স্বার্থপরতায়। তিনি পার্টির এই আচারণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। পার্টি নিজের আদর্শকে ভুলে, নিজের স্রোতকে ভুলে জাতপাত নিয়ে, হিন্দু-মুসলমান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। যেখানে প্রতিবাদী মানসিকতা নিয়ে সংগ্রামে সামিল হওয়ার কথা সেখানেই দেখা দিয়েছে সংশয়। এই সংশয় থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ আপোষ করেছে নিজের প্রতিবাদী সত্তার সঙ্গে। এছাড়াও লেখক খবরের কাগজের বিভিন্ন ঘটনার কাটিং নিজের কাছে সংগ্রহ করে রাখতেন। তিনি অদ্ভুতভাবে তাঁর লেখার ক্ষেত্রে এইগুলিকে ব্যবহার করতেন। তাই সংবাদপত্রে ছাপা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার কাটিং উপন্যাসে ব্যবহার করতে দেখি। সেরকমই একটি উপন্যাস হল, ‘অন্ধকূপ’। যেখানে পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রবাহে প্রবাহিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তারা যেরকম যেরকম খবর ছাপাতে চেয়েছে সেরকমই খবর ছেপেছে। আর এই সমস্ত খবরগুলোকে বানানো হচ্ছে মধ্যবিত্ত স্তরের সাধারণ মানুষদের দিয়েই যারা এই পুঁজিপতিদের দ্বারাই শোষিত। তাঁদের মধ্যে পুষ্কর একজন, যে পত্রিকার অফিসে কাজ করে এবং এই খুন-জখম, অন্যায়-অত্যাচার, শোষণের ছবিগুলোকে খবর হিসাবে পরিবেশন করছে জনগণের মধ্যে। পরবর্তীতে সে দেখে, যে সংবাদগুলি সে আদতে বানাতে চেয়েছিল যার মধ্যে দিয়ে সুস্থ সমাজের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে সেগুলি ছাড়া পুষ্কর বানিয়েছে শুধুই খুন-জখম আর রাহাজানির খবর। কোন সৃষ্টিশীল বা কোনো সুসংবাদ সে বানায়নি। তাই তার এত দিন পর মনে হয়েছে—

> “খুন জখম ধর্ষণ দুর্ঘটনা ডাকাতি ছিনতাই বধূ হত্যা রাহাজানি আত্মহত্যা... এর মধ্যে আমি বুঁদ হয়েছিলাম?
> রসিয়ে রসিয়ে এই খবর করেছি?
> সংবাদ দাতারা কি শুধু এই খবরই পাঠাতো?
> পুষ্কর থমকে পড়ে, আর লেখাগুলোও বা এমন কি দারুন?
> এই লিখে আমি ওদের মন কেড়েছি, ঈর্ষার পাত্র হয়েছি?
> খুন জখম ধর্ষণ দুর্ঘটনা দাকাতি...আহ্
> সংবাদদাতারাও কি এর মধ্যে ডুবেছিল? আর কোনো ঘটনা ঘটেনি সেখানে? নাকি লোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর, অস্বাভাবিক ঘটনাই ওদের কাছে সংবাদ পদবাচ্য হয়ে উঠেছে? কে এমন নির্দেশ দিয়েছে তাদের? আমাকেও? আমি তো সেই সব খবর পরিবেশন করেছি, নাকি আমি নিজে অজান্তে আসতে আসতে নেমে গেছি পাঁকের মধ্যে?”[৬]

এখানে আমরা দেখি পুষ্কর শুধু এই খুন জখম, রাহাজানি, ধর্ষণ ও ডাকাতির খবরই করে গেছে এতদিন পর্যন্ত। এর বাইরেও যে একটা সুন্দর পৃথিবী থাকতে পারে সেটা এই খবরের ভিড়ে সে ভুলেই গেছে। পুষ্কর তাই এই পাঁক থেকে নিজেকে বার করে নিতে চাইছে এবং একটা সুন্দর পৃথিবীর খোঁজ করতে চাইছে।

‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে’ লেখকের এই উক্তি উত্তাল ও উত্তপ্ত সময়কেই ইঙ্গিত করে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি অনুভব করতে পেরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই বীভৎস রূপ। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সামনে সাধারণ মানুষ কতটা তুচ্ছ। মানুষের মূল্যবোধের চরম বিপর্যয়ের ফলে আদতে মানবজাতির অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। এই কালপর্বে দাঁড়িয়ে লেখক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই মূল্যায়নের ফসল ‘আমিষাশী তরবার’ নামক উপন্যাসটি। যেখানে মানুষের মূল্যবোধের চরম বিপর্যয়। পেশি শক্তির রূঢ় দম্ভের কাছে মানুষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 433 – 443
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অসহায়। শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর কাছে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে অসহায় হয়ে পড়ে দুর্বল গোষ্ঠী। আর স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে সেই ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছেদ করে দেয় সেই শক্তিশালী জনগোষ্ঠী। আর এখানেই উঠে আসে আমাদের কাছে পেশি শক্তির নির্মম রূপ। আর এইভাবেই হয়ে চলেছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। উপন্যাসে দেখি—

> "প্রথম দল চলে যাবার পর এর একদল এখানে আসে হয়তো স্থায়ী বসতি গড়ার ইচ্ছে নিয়ে। তারা ছোটো ছোটো টং ঘর বানিয়ে কৃষিকাজ ও পশুপালন শুরু করে, আর তারা থিতু হয়ে বসার সময়ই আগন্তুকরা এসে পড়ে বাঁধ ভাঙ্গা তোড়ের মতো প্রায়, কিন্তু বিশেষ কোনো হইচই তোলেনা তারা, খুবই নিঃসন্দেহে এদের প্রায় হটিয়ে গভীর প্রত্যন্তে পাঠিয়ে দেয় এবং তারপর নড়ার নাম করে না একেবারে।"[৭]

এই ভাবেই বাঁধ ভাঙ্গা তোড়ের মতই আসে তারা। আর তাদের থেকে দুর্বলকে তারা হটিয়ে দেয় গায়ের জোরে। এবং দাবী করে তারাই ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না তিনি বাস্তুহারা মানুষের কথা এখানে বলছেন। যারা নিজেদের মতো করে একটা স্থায়ী আস্তানা বানিয়েছিল তাদেরকে হটিয়ে দিচ্ছে কোনো এক শক্তিশালী গোষ্ঠী। এই উপন্যাসটিতে লেখক উল্লেখ করেছেন যে—

> "দেশবিভাগ, দেশ ভাগের পর অসংখ্য শরণার্থী আসা, তাদের শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই নেওয়া ইত্যাদির কিছু পরে ঘটে ময়নাবাড়িতে আগুন্তুকদের আসা কোনো এক সময়ে। তবে এরা শিবিরে আশ্রয়প্রার্থী হয়নি, সরাসরি চলে আসে স্বদেশ থেকে একেবারে ময়নাবাড়িতে। আর এসেই আস্তে আস্তে হটিয়ে দেয় তাদের, যারা অনেক যত্নে গড়ে তুলেছিল তাদের স্থায়ী আবাস দারিদ্রের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে তবু।"[৮]

আমাদের ধারণা এই উপন্যাসের প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশভাগের পরবর্তী ঘটনা যা লেখকের পাবনায় থাকাকালীন ঘটেছিল সেটিরই বাস্তব নির্মাণ।

পাবনাতে থাকাকালীনই আমরা দেখি স্কুল জীবনে বন্ধুত্ব হয় সুরজিৎ বসুর সঙ্গে। দীর্ঘ সময় পরে তাঁর গল্প উপন্যাস পড়ে লেখকের মনে হয়েছে তাঁর লেখায় পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ ওই অঞ্চলের বাস্তবের সঙ্গে মিশে থাকা কিংবদন্তীমূলক গল্প তাঁর গল্প উপন্যাসে থাকতেই পারত। আর এখানেই আমাদের মনে হয় সুরজিৎ বসু 'বাস্তবের সঙ্গে মিশে থাকা কিংবদন্তীমূলক গল্প' তাঁর গল্প উপন্যাসে ব্যবহার না করায় লেখক যেন তাঁর উপন্যাসে এই বাস্তবের সঙ্গে মিশে থাকা কিংবদন্তীমূলক গল্পকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। আর এরই সূত্র ধরে লেখকের উপন্যাসে অতিবাস্তবের ছোঁওয়া এসেছে বলে আমাদের ধারণা। তাই 'আমিষাশী তরবার' উপন্যাসে দেখি ময়নাবাড়ি থেকে ময়নারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় সামন্দ ব্যাধের পীড়নে। যাবার সময় ময়নারা বলে দিয়ে যায় যে, তারা আবার আসবে অন্য বেশে এবং তখন তারা এর প্রতিশোধ নেবে। এর মাঝে অনেকটা সময় কেটে যায়। সেখানকার বাসিন্দারাও সেই ময়নাদের কথাও স্বাভাবিকভাবেই ভুলে যায়। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যভাগে গিয়ে দেখি ময়নাবাড়ি গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। তাদের প্রতিপালিত গবাদি পশু বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। এর কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে জানা যায় যেটা, সেটা হল চিতা বাঘেরা রাতের অন্ধকারে এই আক্রমণ শানাচ্ছে। আর ঠিক তখনই বৃদ্ধ যোগেন্দ্র জানাই, তারা এসে পড়েছে। আর গ্রামবাসীদের রক্ষা নেই। তারপর গ্রামবাসীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই ময়নাদের বিতাড়িত ও ফিরে আসার ঘটনা বলে। তাতে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আর উপন্যাসের শেষে গিয়ে দেখি ময়নারা আকাশ থেকে নীচে নামতে থাকে আক্রমণের ভঙ্গীতে এবং তাদের লোম খসে পড়ে বেরিয়ে আসে দাঁত নখ থাবা আর লহমায় তারা হয়ে ওঠে এক একটা চিতা। আবার উল্টোদিকে সমাজে দুর্নীতির দিককে সরাসরি সামনে নিয়ে না এসে রূপকের আশ্রয় নিচ্ছেন লেখক। সেখানে রতন কুকুরদের মাধ্যমে কেড়ে নিয়ে বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে উঠছে। তারপর সেই কুকুরদের সঙ্গে সে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু বেশিদিন অতিক্রান্ত না হতেই দেখি উপন্যাসের শেষে এসে রতন ঠিক ওই 'কুকুর' দের সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে। আদতে এই কুকুররা হল সমাজের সেই সমস্ত দুষ্কৃতি যারা কেড়ে নেওয়াকেই পেশা

হিসেবে বেছে নেয়। অন্যদিকে 'অন্তরীণ' উপন্যাসে দয়ালের জীবনের দুটি চরম সত্যকে সামনে রেখে উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেন লেখক। এক অশরীরীকে দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করিয়ে সেই সত্যে উপনীত করছেন লেখক দয়ালকে। আর সেই সত্যে পৌঁছানোর জন্য অতিবাস্তব ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করছেন। আখ্যান এই ধরনের অতিবাস্তব ঘটনার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। যেখানে আমরা দেখতে পায় দয়ালের কাছে একটি আয়না আসে। সেটিতে যার কথা ভাবা হয় সেই ওই আয়নায় প্রকট হয়ে যায় এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। উপন্যাসের একটা পর্যায়ে এসে কুসুমরানীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছে দয়ালের। তাঁর কাছ থেকেই দয়াল জানতে পারে এই রাজ্যের রাজার পীড়নে গোটা রাজ্যবাসী বিক্ষুব্ধ। যেকোনো মুহূর্তে রাজ্যবাসী রাজার উপর আক্রমণ করতে পারে। আর এই অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে অক্ষয় বণিক্য নামে একজন ব্যবসায়ী। যে কিনা কুসুমরানী ও দয়ালকে বন্দী করে রেখেছে রাজার নজরে নিজেকে রাজার শুভচিন্তক প্রমাণ করার জন্য। দয়ালকে রাজার কাছে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে দয়ালকে সবরকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া এবং জনগণের হাতে রাজার করুণ পরিণতি। এ সবকিছু আন্দাজ করতে পেরে দয়ালকে রাজা সাজিয়ে রাজ্যবাসীর সামনে আনা। এবং দয়ালের করুণ পরিণতি এসবই উপন্যাসের শুরুতে ভবিষ্যৎবাণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

এতো গেল তাঁর লেখার রসদ এর উৎস। আবার দেখা যাক তাঁর সাহিত্য রচনার পিছনে কোন মনোভাব কাজ করেছে। কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতিচারণা থেকে সেই দিকগুলিকে উন্মোচন করার প্রয়াস আমাদের এখানে থাকবে। সেরকমই একটি ঘটনার উল্লেখ পায় কার্তিক লাহিড়ীর কন্যা শর্মিষ্ঠা নিয়োগী লাহিড়ীর স্মৃতিচারনা থেকে, শর্মিষ্ঠা নিয়োগী বলছেন, বাবা বিশ্বাস করতেন—

> "লেখা মানে তো আলাদা কিছু নয়—যা তোমার মনের কথা—সেটাই লেখা হয়ে ফুটবে।"[৯]

এখানে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না লেখক নিতান্তই নিজের মনের অনুভূতিকে ব্যক্ত করছেন এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। তাঁর সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা, অনুরাগের কারণ সবকিছুর উত্তর যেন তিনি আমাদের দিচ্ছেন। লেখাকে তিনি তাঁর জীবন থেকে আলাদা করে ভাবেননি। তাঁর কাছে লেখা হচ্ছে মনের মধ্যে তৈরি হওয়া বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের আলোড়ন। যেখানে ভিড় করেছে নানান অভিজ্ঞতা। জীবন অভিজ্ঞতায় দাঁড়িয়ে তাঁর মনের মধ্যে যা জমে উঠেছে সেটাকেই লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তিনি। তিনি এও বিশ্বাস করতেন, 'লেখার মাধ্যমে মানুষ তার দুঃখকষ্ট ভুলে থাকতে পারে। অর্থাৎ লেখা হল এক ধরনের এক্সপ্রেশান যা কিনা তোমার মনকে অন্য একটা লেভেলে নিয়ে যাবে যেখানে সাময়িক হলেও তুমি আনন্দ পাবে। মনের ভার লাঘব হবে'। স্বাভাবিকভাবেই এই 'ভার' লেখকের কাছে যথার্থই কষ্টদায়ক। লেখকের যখন ষোলো বছর বয়স তখন তিনি প্রত্যক্ষ করছেন দেশভাগের মতো একটি ঘটনাকে। তাঁর স্মৃতিপটে দাগ রেখে গেছে নিশ্চিতভাবে এর ভয়াবহতা। আর অর্জন করেছেন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং সেখান থেকে তিনি তাঁর বাকি জীবনের চলার পথে সঙ্গে করেছেন সেই সমস্ত ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতকে ও সত্য-মিথ্যাকে। তিনি এও মনে করেন তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার পিছনে এই সমস্ত ঘটনার সত্যতা গভীরভাবে কাজ করে চলে। তাই তিনি বলেন—

> "প্রত্যেক সৎ ও প্রকৃত শিল্পই হচ্ছে সচেতন প্রয়াসের ফল। হয়তো লেখার সময় পরিকল্পনার হুবহু রূপায়ন সম্ভব হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অদল বদল হয় স্বাভাবিক নিয়মের অধীন, তবু একথা স্বীকার্য যে, লঘু তরল চপল মনের খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার উদার ক্ষেত্র শিল্প সাহিত্য নয়, এখানে শিল্প সাহিত্যের অর্থ যথার্থ ও সৎ শিল্প সাহিত্য।"[১০]

এখানে এই 'যথার্থ ও সৎ শিল্প সাহিত্য' সৃষ্টি করার প্রয়াসী থেকেছেন লেখক। প্রত্যেকটি ঘটনার সত্য ও মিথ্যাকে যাচাই করতে চেয়েছেন লেখক। তাই যখন জলপাইগুড়ি থেকে আগরতলায় চলে আসেন লেখক তখন বিষ্ণু দে তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাস নিয়ে মন্তব্য করে চিঠি লিখে তাঁকে জানাছেন যে, 'সিরিঅসনেস নভেলটিতে স্পষ্ট, এবং সে গুণটি আজ দুর্লভ মহাগুণ'। আবার পরের চিঠিতেই অন্য একটি উপন্যাস পড়ে বিষ্ণু দে লেখককে আবার জানাছেন, 'সীরিঅস্। সানুকম্প মানবিক'। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না লেখক তাঁর উপন্যাসের প্লটের জন্য গুরুগম্ভীর বিষয়কেই প্রাধান্য দিচ্ছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 433 – 443
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখা যখন 'সিরিয়াস' তখন তাঁর লেখার বিষয় যখন হয়ে উঠবে একান্তই 'মানুষ' ও তাদের সুখ দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কথা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা যেগুলি সমাজের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রভাবিত করছে। আর প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ যতই সামাজিক হয়ে উঠেছে ততই তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর হয়ে উঠেছে। এবং নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদও বেড়েছে। তাই লেখক বলেন 'উপন্যাসই একমাত্র শিল্প যার উপজীব্য হচ্ছে গোটা ব্যক্তি মানুষ, সেই জীবনের সর্বাত্মক রূপায়ন।' লেখকের কাছে উপন্যাসই একমাত্র সংরূপ যার মধ্যে একটি গোটা ব্যক্তিমানুষকে ধরা যায়। আবার সুরজিৎ বসু সম্পর্কে স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে একটি জায়গায় তিনি বলছেন—

> "ক্লাসিকাল ঔপন্যাসিকের নির্মোহ তার মধ্যে থাকলেও আমার মধ্যে নেই, আমি ভাঙচুর করার পক্ষপাতী, প্রথাসিদ্ধ সমস্ত ক্রিয়াবিরোধী।"[১১]

লেখকের মুখে অকপট স্বীকারোক্তি, তিনি 'ভাঙচুর করার পক্ষপাতী, প্রথাসিদ্ধ সমস্ত ক্রিয়াবিরোধী' আর তাই আমরা তাঁর উপন্যাসে চেনাছকের কোন প্লট খুঁজে পায় না। এখানে তিনি উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে কী ধরনের মানসিকতা পোষণ করেন তার একটি স্পষ্ট ধারণা আমরা পাচ্ছি। লেখালিখির যে সমস্ত প্রথাসিদ্ধ নিয়মকানুন সেগুলিকে তিনি ভাঙতে চাইছেন। উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে তিনি 'আদি-অন্ত' এই ধারনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই আমরা দেখি তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্গূঢ় জীবন উন্মোচনের দ্বারা ঘটনা চালিত হয়। লেখার ধরন পাল্টে যায়। তাঁর উপন্যাস পড়তে গিয়ে তাই বার বার থেমে যেতে হয়। একটা ঘটনার পর আর একটি ঘটনার উপস্থিতি বিচ্ছিন ঘটনা মনে হলেও সেটি যেন বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। লেখকের কথায়, 'বিশ্লেষণের বিচ্ছিনতার মধ্যেও ঐক্য স্থাপন সম্ভব হয় এবং জীবনের বিরাট তাৎপর্য সেই সূত্রে ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয় উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে।'

তাঁর 'আমিষাশী তরবার', 'আবিরের আবিষ্কার' ও 'অন্তরীণ' প্রভৃতি উপন্যাসে স্বপ্ন ও বাস্তবতাকে আশ্রয় করে অতিবাস্তব কাহিনি তৈরি করছেন লেখক। আর এই অতিবাস্তব কাহিনি তৈরি করার পিছনে লেখকের কল্পনা শক্তিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন লেখকের স্বাধীন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষেত্রে বেশি জোর দেওয়া উচিত। লেখকের বাইরের ঘটনার প্রতি বেশি মনোযোগ তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে খর্ব করে দিতে পারে। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলনে—

> "বাইরের ঘটনার ওপর অতিরিক্ত মনোযোগ দিলে মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মদক্ষতার বিষয়টি বহুলাংশে উহ্য থাকতে বাধ্য।"[১২]

তাই লেখককে সচেতন থাকতে হয় তার সৃষ্টিশীলতার প্রতি।

ছাত্রাবস্থা থেকেই কার্তিক লাহিড়ী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেটির নাম কমিউনিস্ট পার্টি। এই সংগঠনের আদর্শের দ্বারাই তিনি স্বাভাবিক ভাবে চালিত হচ্ছিলেন। তাঁর একটি স্মৃতিকথায় জানতে পারি চিন্মোহন সেহানবীশ পার্টির সদস্যদের সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, তাঁর কথাটি হল 'সংগঠনের কাজকে হেয় চোখে দেখি, যেন সৃষ্টিশীল লেখক বা বুদ্ধিজীবীদের জন্য সে কাজ বরাদ্দ নয়। তা করবে তাঁর চেয়ে নীচের থাকের মানুষ জন।' এখানে চিন্মোহন সেহানবীশ-এর বক্তব্যের সঙ্গে লেখককে একমত হতে দেখি। তাই যখন সংগ্রামী মানসিকতা নিয়ে সমস্ত রকমের বাঁধা বিপত্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা, সেখানে পার্টির ভাঙ্গন লেখককে ব্যথিত করেছে। পার্টির নের্তৃত্বস্থানীয় যারা সেই সময়ে তারা সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলে রাজনৈতিক সংঘাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে মধ্যবিত্ত মানসিকতাতেই ধরা দিয়েছেন। তাই লেখক আক্ষেপ করে বলেছেন—

> "শত সহস্র যুবকের মৃত্যু দেখেও তাঁদের কলম প্রতিবাদে ঝলসে ওঠেনি। এর থেকে তাঁরা বুর্জোয়া কাগজের সেবা দাসের কাজে এবং রাষ্ট্রশক্তির কাছাকাছি থাকাটা নিরাপদ ভেবে এসেছিলেন। সময়োচিত প্রতিবাদ-ট্রতিবাদ কখনো সখনো উঁকি ঝুঁকি দিলেও তা যৎকিঞ্চিৎ। মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে, জীবনের জটিলতার সঙ্গে সংগ্রামী মানসিকতায় সামিল হওয়ার

> ব্রতে আমরা অঙ্গীকার বদ্ধ থেকেও মাঝে মাঝে ধাক্কা খেতে খেতে পেছু হটছি-প্রশ্ন তুলছি বাঙালি–অবাঙালির–জাত-পাতের, প্রশ্ন তুলছি হিন্দু মুসলমানের।"[১৩]

এত কিছুর পরেও লেখক বিশ্বাস হারাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন এই সমাজকে তরুণ প্রজন্মই আবার বাঁচিয়ে তুলবে। তাই তিনি বলেন—

> "আজকেই ছেলেরাই তো আশা জাগাচ্ছে, এই পচা-মরা সমাজকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য তারা বদ্ধপরিকর, দিকে দিকে আজ দুর্নীতির অচল অবস্থা, আমরা কী, আমরা তো এই ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখছি নিজেদের স্বার্থে, আর এরা? ...তারা আমাদের মতো ফাঁকিবাজ নয়, হয়ত এই নিউ জেনারেশনই আমাদের মুক্তির পথ দেখাবে।"[১৪]

লেখক এখানে আশাবাদী। এই সমাজকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যেমন বিশ্বাস রাখছেন তরুণদের উপর তেমনি এটাও ভুলে যাননি যে এই পরিস্থিতির জন্য প্রবীণদের স্বার্থপরতাই দায়ী। আবার একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লেখকের গলায় একই আক্ষেপের সুর ফুটে ওঠে—

> "কোথায় মুক্তমতি হওয়ার দরকার ছিল আমাদের, তা নয় গণ্ডিবদ্ধ রাজনীতি এনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব নষ্ট করতে থাকি। নাকি আমাদের রাজনীতির মধ্যে বরাবরই সংকীর্ণতার একটা চোরা স্রোত লুকিয়ে ছিল, যাতে আমাদের চেয়ে দলের, দলের চেয়ে উপদল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ছদ্মবেশে একজনের কর্তৃত্ব-ই সর্বৈব হয়ে পড়ে?"[১৫]

একদিকে লেখক যেমন ব্যক্তির অন্তর্গূঢ় জীবনের ঘটনাকে উন্মোচন করতে করতে এগিয়ে যান আবার সামাজিক পটে দাঁড়িয়ে সেই জীবনের নানা সমস্যাগুলির সমাধান খোঁজারও চেষ্টা করে যান নিরন্তর। তাই তাঁর উপন্যাস ভাবনাকে সাবেকি সংজ্ঞায় বিচার করতে গেলে আমাদের ধন্দে পড়তে হয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ বা বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তিনি যেমন বিশ্বাসী ছিলেন ঠিক তেমনিই লেখকের মনে আরও অনেক বিষয় নিয়েও অনুরাগ জন্মেছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত জগতের কিংবদন্তী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ, এই দুটি মানুষ তাঁর সংগীতের প্রতি অনুরাগের অন্যতম কারণ। এই দু'জন মানুষের সংগীত সাধনা লেখককে উৎসাহী করেছিল নিঃসন্দেহে। তিনি আগরতলা থেকে প্রায়ই কলকাতার উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে আসতেন। আলাপ করে এসেছিলেন ভীমসেন যোশীর সঙ্গে। উচ্চাঙ্গ সংগীতকে ভাল করে বুঝতে তিনি প্রথমে তবলা শিখতে শুরু করেন। তাতে তিনি থেমে থাকেননি। তিনি শিখতে শুরু করেন এস্রাজ। আগরতলায় থাকার সময় তিনি প্রসিদ্ধ সরোজবাদক শ্রী লহরী দেববর্মণের কাছে শিখতে শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিখ্যাত সারেঙ্গীবাদক সাগিরুদ্দিন খান সাহেবের কাছেও তিনি গিয়েছিলেন শেখার জন্য। কার্তিক লাহিড়ী শুধুমাত্র এই উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতিই আকৃষ্ট ছিলেন এমনটা নয়। তিনি পছন্দ করতেন আধুনিক গানও। সাথে নজরুল গীতি এবং হিন্দি সিনেমার গানও। এই গানগুলো তিনি শুধু শুনতেনই না সেগুলির যথোপযুক্ত সমালোচনাও করতেন। সলীল চৌধুরী ও দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্র সংগীত ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয়। রাহুল দেববর্মণের সুরারোপিত কিছু গান তিনি পছন্দ করতেন। ইংরেজি/বিদেশী সংগীত নিয়েও লেখকের ছিল গভীর আগ্রহ ও পড়াশোনা। পছন্দ করতে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা[1] শুনতে। সঙ্গে শুনতেন ধ্রুপদী সুরকার পিওতর ইলিচ চাইকোভস্কি[2] এর গানও।

---

1. বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা তৈরি করা সম্মিলিত একটি বিশেষ সুর।

2. Pyotr IIyich Tchaikovsky (1840-1893) : রোম্যান্টিক যুগের একজন রাশিয়ান সুরকার। যাকে রাশিয়ার প্রথম সংগীত নির্মাতা হিসাবে ধরা হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 433 – 443
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এছাড়াও কার্তিক লাহিড়ীর আগ্রহ ছিল মন্দির-মসজিদ নিয়ে। তাই তিনি মন্দির মসজিদ দেখার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করেছেন। সেখানকার মন্দির মসজিদ সম্পর্কে পড়াশোনা এবং সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বোঝার চেষ্টা করতেন। তাই আমরা দেখতে পায় 'ত্রিপুরার মন্দির' নামে লেখকের একটি বই ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও আর একটি বই ১৯৮৯ সালে প্রকাশ পাচ্ছে যেটির নাম 'মন্দির মসজিদ গির্জা মঠ'।

এইভাবেই লেখকের জীবন এই দীর্ঘ কালপর্বে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্ভারকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন আখ্যানের মাধ্যমে। তাই এই সমস্ত আখ্যান হয়ে উঠেছে স্বমহিমায় প্রাণবন্ত।

কার্তিক লাহিড়ীর রচনা তালিকা

উপন্যাস :

'যাওয়া' (১৯৭৮), 'দশরথ নামের একজন' (১৯৮২), 'অভি' (১৯৮২), 'ইভাবিভাদের গল্প' (১৯৮৬), 'আমিষাশী তরবার' (১৯৮৭), 'যুবক' (১৯৯০), 'অন্ধকুপ' (১৯৯০), 'সৌভিকের ঘরে আগুন' (১৯৯১), 'শনি' (১৯৯২), 'অপহরন' (১৯৯২), 'কলকাতা সমুদ্র' (১৯৯৩), 'রক্তবীজ' (১৯৯৩), 'অন্তঃসত্ত্বা' (১৯৯৫), 'স্নায়ুযুদ্ধ' (১৯৯৫), 'রাহু' (১৯৯৬), 'অরাজক' (১৯৯৭), 'সৈকতে নির্জন শরীর' (১৯৯৭), 'অন্ত্যজ' (১৯৯৮), 'খাঁচা' (১৯৯৮) 'কাপুরুষ' (১৯৯৯), 'আজ রবিবার' (১৯৯৯), 'আবিরের আবিষ্কার' (২০০০), 'তবুও স্বপ্ন' (২০০১), 'অন্তরীণ' (২০০১), 'অহঙ্কার' (২০০১), 'শৌভিক এবং সৌভিক' (২০০২), 'অপদেবতা' (২০০২), 'নীলরক্ত' (২০০৩) 'যদি' (২০০৪), 'আকাশ কুসুম' (২০০৫), 'নষ্টস্বপ্ন' (২০০৬), 'হাওয়ার রাত' (২০০৬), 'সহদেবের জীবনযাপন' (২০০৭), 'বিদ্যুতের ক্ষণিক বিচ্ছেদ' (২০০৭), 'স্বেচ্ছামৃত্যু' (২০০৮), 'লালফিতের গেরো' (২০১০)।

যে সমস্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না :

'পাণ্ডুলিপি' (১৯৪৮), 'পূর্বাভাষ' (১৯৪৯) 'এক অধ্যায়' (১৯৬২), 'কালকেতু' (১৯৬৩)।

গল্পগ্রন্থ :

'আমার বাগানে এত ফুল' (১৯৮৫), 'নির্বাচিত কুড়ি' (২০০২) 'গল্প সমগ্র'-১ম খণ্ড (২০০৩), 'গল্প সমগ্র'-২য় খণ্ড (২০০৫)

নাটক :

'বটুর জীবন পিস্তল ও রিভলভার' (১৯৮২), 'সমিধ' (১৯৮২), 'জাতশত্রু' (১৯৮২), 'হত্যাকাণ্ড' (১৯৮৩), 'বায়োস্কোপ' (১৯৮৩), 'সংঘর্ষ' (?) 'সান্ধ্য আইন' (১৯৮৪), 'ডাকাত' (১৯৮৪), 'লোকনাথের প্রবেশ ও পরিণতি' (১৯৮৪), 'সূর্যমুখী' (১৯৮৫), 'দশতল্লাটের প্রধান' (১৯৯০), 'বিপন্ন' (১৯৯৩), 'রথ কিংবা রণক্ষেত্র' (১৯৯৭)।

শ্রুতিনাটক :

'যবনিকা' (১৯৫৪), 'মঙ্গলসূত্র' (১৯৮৪), 'উষ্ণীষ' (১৯৮৫) 'পশু' (১৯৮৫), 'লভনীড়' (২০০৭)।

প্রবন্ধ গ্রন্থ :

'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি' (১৯৭২), 'ত্রিপুরার মন্দির' (১৯৭৩), 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস' (১৯৭৪), 'সৃজনের সমুদ্রমন্থন' (১৯৮৪), 'মন্দির মসজিদ গির্জা মঠ' (১৯৮৯), 'পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলা উপন্যাস' (১৯৯৮), 'কলকাতার গ্রাম্যতা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী (২০০৯), 'রবীন্দ্রনাথ : নাটক রঙ্গমঞ্চ অভিনয়' (২০১৪)।

অনুবাদ গ্রন্থ :

'ঈশোপনিষদ ও আমরা' (?), 'মায়াকভস্কি : আমার কথা ও নির্বাচিত রচনা' (১৯৮৬)।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 433 – 443
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. লাহিড়ী, কার্তিক, 'মেলা-মেশা', সত্রাজিৎ গোস্বামী (সম্পাদিত), পরম্পরা পত্রিকা, কলকাতা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৬, পৃ. ২০৭
২. লাহিড়ী, কার্তিক, 'দশটি উপন্যাস', প্রতিভাস, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ২২৩
৩. নিয়োগী, শর্মিষ্ঠা, 'আমার বাবা', বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), পরিচয় পত্রিকা, কলকাতা, ৮৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ-জুন ২০১৮, পৃ. ৮
৪. ঐ, পৃ. ৭
৫. ঐ, পৃ. ৭-৮
৬. লাহিড়ী, কার্তিক, 'অন্ধকূপ', উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পৃ . ১০০
৭. লাহিড়ী, কার্তিক, 'দশটি উপন্যাস', প্রতিভাস, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ১৪
৮. ঐ, পৃ. ১৫
৯. নিয়োগী, শর্মিষ্ঠা, 'আমার বাবা', বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), পরিচয় পত্রিকা, কলকাতা, ৮৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ-জুন ২০১৮, পৃ. ১০
১০. লাহিড়ী, কার্তিক, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস', প্রতিভাস, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৩০
১১. লাহিড়ী, কার্তিক, 'মেলা-মেশা', সত্রাজিৎ গোস্বামী (সম্পাদিত), পরম্পরা পত্রিকা, কলকাতা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৬, পৃ. ২১২
১২. লাহিড়ী, কার্তিক, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস', প্রতিভাস, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ২৮
১৩. লাহিড়ী, কার্তিক, 'সৌরভের ঘরে আগুন', বিজ্ঞাপন পর্ব, কলকাতা বইমেলা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২, পৃ. ২
১৪. লাহিড়ী, কার্তিক, 'দশটি উপন্যাস', প্রতিভাস, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ১০৮
১৫. লাহিড়ী, কার্তিক, 'মেলা-মেশা', সত্রাজিৎ গোস্বামী (সম্পাদিত), পরম্পরা পত্রিকা, কলকাতা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৬, পৃ. ১৯৫